কেরু এন্ড কোং

কেরু এন্ড কোং

মোস্তাফিজ কারিগর

কেরু এন্ড কোং
মোস্তাফিজ কারিগর

প্রকাশকাল
প্রথম প্রকাশ : অমর একুশে গ্রন্থমেলা ২০২০

প্রকাশক
কবি প্রকাশনী
৮৫ কনকর্ড এম্পোরিয়াম বেইজমেন্ট
২৫৩-২৫৪ এলিফ্যান্ট রোড কাঁটাবন ঢাকা ১২০৫

স্বত্ব
লেখক

প্রচ্ছদ
মোস্তাফিজ কারিগর

বর্ণবিন্যাস
মোবারক হোসেন

মুদ্রণ
কবি প্রেস
৮৫ কনকর্ড এম্পোরিয়াম মার্কেট কাঁটাবন ঢাকা ১২০৫

ভারতে পরিবেশক
অভিযান পাবলিশার্স
১০/২ এ রমানাথ মজুমদার স্ট্রিট কলকাতা

মূল্য: ২০০ টাকা

Carew & Co. by Mostafiz Karigar Published by Kobi Prokashani 85 Concord Emporium Market Kantabon Dhaka 1205 First Edition: February 2020 Cell: +88-01717217335 Phone: 02-9668736
Price: 200 Taka RS: 200 US 10 $
E-mail: kobiprokashani@gmail.com Website: kobibd.com

ISBN: 978-984-94412-2-9

ঘরে বসে কবি প্রকাশনী'র যে কোনো বই কিনতে ভিজিট করুন
www.rokomari.com/kobipublisher
অথবা ফোনে অর্ডার করুন ০১৫১৯-৫২১৯৭১ হটলাইন ১৬২৯৭

উৎসর্গ

জাহিদ সোহাগ
সৌম্য সরকার
সজল আহমেদ
খালেদ চৌধুরী

সূচিপত্র

অন্ধকারের ছায়া ৯
আয়নাল হকের সাথে ১৩
জাহাজের দরজা ১৯
অ্যাক্টিওগ্রাফি মেশিনে ভূত ২৫
ডা. মোকাদ্দেসের ফ্ল্যাট ৩৩
ছয়শ ত্রিশ ৩৮
পারফর্মিং আর্ট ৪৪
শহরের মিথ্যেবাদী লোকটির হাতে বরফের মুখোশ ৫০
কায়াশূন্য প্রতিবিম্বের গুনাহ ৫৮
গন্ধভাদালি ৬৬
ভি. এস. নাইপল এন্ড এ ম্যাজিক নাইট ৭৩
আলো-অন্ধকার উৎসব ৭৮
পুতুল ৮৪
শব্দ ৮৯
জানালা ৯৩

অন্ধকারের ছায়া

মফস্বল শহরের বুকের ভেতরের ছোট্ট আদুরে স্টেশনের প্লাটফর্ম থেকে নেমে কিছুটা পশ্চিমে রেললাইন ধরে এগিয়েই ছোট ছোট ঘুপচি ঘরগুলোর কোনো একটাতে ঢুকে পড়েছিলাম আমি; আমার প্রথম প্রেমিকা যখন আমাকে না জানিয়েই অন্য একজন পুরুষের দেয়া আঙটি হাতে পরে ঢ্যাং ঢ্যাং নাটক এঁটে আমার সামনে এলো, তখনই প্রেমিকার ওপর চরম ক্রোধ থেকে আমি এক ঘুপচি ঘরের এক মধ্যবয়সী নারীর কাছে গিয়ে মাত্র ২০ টাকার বিনিময়ে নিজেকে শান্ত করতে চেয়েছিলাম। প্রথম সঙ্গমের মধ্যবয়সী সেই নারীর মুখটা আমি কোনোদিনই আর মনে করতে পারি না। ঘুপচি ঘরের টিমটিমে আলোয় তার মুখটার দিকে আদতেও আমি তাকিয়েছিলাম কিনা একদম মনে নেই। ঘরটার বাইরে দাঁড়িয়ে থাকা এক বৃদ্ধলোক আমাকে ইশারায় ডেকেছিল। ছোট একটা তক্তপোশের ওপর আমি গিয়ে বসলাম। ঘরের ভেতরের আরও একটা ছোট্ট ঘুলঘুলি পাকানো কক্ষের পর্দা সরিয়ে মধ্যবয়সী সেই নারী এসে নিজে নিজেই সালোয়ার খুলে আমার সামনে ব্যাঙের মতো দুটো ঠ্যাং কেলিয়ে শুয়ে পড়ল। ময়লা আলোতে তার শরীরের রঙ সম্পর্কে আমার কোনো স্মৃতি তৈরি হয়নি। তার ঘর থেকে বেরুনোর পর রেললাইন ধরে ঘণ্টার পর ঘণ্টা হেঁটে গিয়ে জগতি রেলস্টেশনের ভৌতিক প্লাটফর্মে অনেকক্ষণ বসে ছিলাম। দিনের বেলা দুটো তিনটে রেলগাড়ি এই স্টেশনে থামে। সন্ধ্যার পর থেকে আর কোনো রেলগাড়ি এই লাইনে চলে না। স্টেশনের কপালের এক কোনে একটা টিমটিমে আলো, আলোর নিচে অনেকগুলো নতুন পাখা গজানো পিঁপড়েরা নিজেদের মৃত্যু নিয়ে খেলছে। পরিত্যক্ত স্টেশন মাস্টারের কক্ষ থেকে কয়েকটি চামবাদুড় বাইরে বেরুচ্ছে আর কিচিকিচি করতে করতে ভেতরে ঢুকছে। আমার প্রতারক প্রেমিকার শরীরের প্রতি গড়ে ওঠা আমার লোভ আমাকে বিধ্বস্ত করে যাচ্ছিল। আমি ওর নরম হাত ধরেছি। বারদুয়েক কষে ওর পাতলা ঠোঁটের লবণ আমি নিয়েছিলাম। সত্যিই ভালোবাসা দিয়ে ওর জাদু দেখার জন্যে আমি অপেক্ষা করতাম। মশুরের ডালের মতো ওর শরীরের রঙ আমি

চোখের ভেতরে আঁকতে গিয়ে হেরে গেলাম। অসংখ্য খাঁজকাটা কালো পর্দা বাতাসে খেলে খেলে আমার চোখটাকে ক্লান্ত করে দিচ্ছিল। আমার চোখের সামনে বাণী সিনেমা হলের বিরাট পর্দার মতো একটা আবছা আলোর পর্দা এসে দাঁড়ায়। চারপাশ জড়ানো নিকষ অন্ধকারকে ওভারল্যাপ করে আরও কালো দুটি উদোম মূর্তি — পুরুষ তার বাহুতে বল দিয়ে নারীর মোমমূর্তিকে দৃঢ় ধরে, নারীও হেলেসাপের মতো মায়াবী পেঁচিয়ে পুরুষকে পুলকে রেখেছে। তাদের দ্যোতনা ছড়িয়ে পড়ছিল সারা ঘরে। এরকম দৃশ্য আমি প্রথম দেখেছিলাম খুব ছোট বেলায় — বাবা-মায়ের সঙ্গে একই বিছানায় ঘুমানোর বয়স তখন। সেই হর-পার্বতীর মূর্তি আমার ভেতরের চোখগুলোকে বিবশ করে রেখেছিল। প্রথম সঙ্গমের পরে আমার ভেতরে দাঁড়িয়ে থাকা সেই মিথুন ভাস্কর্য আমাকে কষে একটা থাপ্পড় দিয়েছিল। সঙ্গম নিয়ে কৈশোর পরবর্তী সময়ে গড়ে ওঠা কুহকে যেন ঘ্যাচাং করে ছুরি বসিয়ে দিল। আমি মনে মনে ততটাই বেপরোয়া হয়ে উঠলাম, কিন্তু দৃশ্যত কিছুই করতে পারিনি কোনোদিন। যথেষ্ট ভিতু, অনেকটা সুযোগের অভাবও। দ্বিতীয়বার ফাল্গুনের এক খাঁ-খাঁ দুপুরে মুনমুন ওদের জনশূন্য বাড়ির একটা কক্ষে আমাকে ধাক্কা দিয়ে ঢুকিয়ে দিলে আমি গিয়ে পড়লাম ওর বান্ধবী মাহমুদার পেটা শরীরের ওপর। আমি ক্ষুধার্ত নেকড়ের মতো ওর কপাল থেকে নিজের জিহ্বাকে হিল্লিদিল্লি করে আনতে আনতে বুকে এসে যখন আরও ক্ষিপ্র হয়ে উঠেছিলাম, একটা তুমুল ধাক্কায় মাহমুদা আমাকে সরিয়ে দিয়েছিল। মাহমুদা আরও সময় নিয়ে, আরও লাজুক হয়ে, আরও গলে গলে লবণের যে ভাস্কর্য গড়তে চেয়েছিল — আমি তা সত্যিকার অর্থেই ম্যাসাকার করে দিয়েছিলাম। নির্বোধ ও লোভীর মতো। মাহমুদার নামটা মনে আছে, মুখটা মুছে গেছে।

তারও বেশ কিছুকাল পরে ছোট্ট শহরটা ছেড়ে বড় শহরে এসেছিলাম উচ্চ শিক্ষার জন্যে; বন্ধু হয়ে ওঠা সহপাঠীদের অনেকেরই তখন এপট্টি ওপট্টিতে গতায়াত। সেইসব গল্প আমার সামনে হিহি করে হেসে উঠলে হোস্টেলের কমন টয়লেটের সাওয়ারের নিচে দাঁড়িয়ে একটা মায়াবী কালোর ভেতরে নাচতে থাকা মিথুন ভাস্কর্য আমাকে বিহ্বল করে তোলে। আমার টাকা ছিল না, সাহসও। একদিন বড় শহরের বড় ও যানজটের সড়ক ধরে বিমনা হাঁটছিলাম। একটা দ্রুতগামী বাস ধুলোমিশ্রিত বাতাস ছড়িয়ে সাঁই ছুটে গেল। ধুলোবাতাসের আস্তিন সরে গেলে, দেখি — দু-তিনটে একশ, একটা পঞ্চাশ, আরও কিছু খুচরো দুচার টাকা রাস্তায় পড়ে স্বাধীন উড়ছে।

বেশ কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকার পরেও টাকাগুলো কেউ তুলছে না। আমি তুললাম। হাঁক ছাড়লাম। পথচারী কেউ টাকাগুলোর স্বত্ব নিয়ে এগিয়ে এলো না আমার কাছে। অনেকক্ষণ অপেক্ষা করার পর টাকাগুলোর মালিক হয়ে গেলাম আমি। একটা রিকশা করে আধাঘণ্টার মধ্যে পৌঁছে গেলাম মগবাজারের একটা হোটেল পাড়ায়। সারাদিন ঈদে মিলাদুন্নবি বলে সমস্ত হোটেলের দরজা বন্ধ করে দিয়ে দালালগুলো তাস খেলছিল—বলছিল সন্ধ্যায় আসেন। বেশ্যাপাড়াকে এভাবে ধার্মিক হয়ে যেতে দেখে আমার ভীষণ মেজাজ চড়ে গেল। হোটেলগুলোর পেছনের বিরাট লেকটার ধারে গিয়ে মরা দুবলো ঘাসের ওপর ঘুমিয়ে পড়লাম। বিকালে ঘুম চোখ থেকে সরে গেল। কিছু বাদাম কিনে চিবুতে চিবুতে সন্ধ্যার জন্যে জিগির করছিলাম। কুড়িয়ে পাওয়া টাকাগুলো সন্ধ্যায় যেই মেয়েটির পেছনে আমি খরচ করলাম, হোটেল থেকে বেরিয়েই তার চেহারা আর কোনোদিন মনে করতে পারিনি। হোটেলের স্যাঁতসেঁতে কামরার বীর্যপচা গন্ধ মনে আছে, আমাকে ব্ল্যাক মেইল করে বেশি টাকা বাগিয়ে নেয়া দালালের কালো গোপের জেল্লা মনে আছে।

আশ্চর্য অন্ধকারে ফুটে থাকা সঙ্গমদৃশ্যের সেই মূর্তিকে আমি খুঁজতে খুঁজতে শেষবার গিয়েছিলাম দোলপুরের বিশাল পল্লিতে—নানা বয়সের শত শত নারীদের দাঁড়িয়ে থাকা চোখের ভেতর থেকে, ওদের ঠোঁটে আলকাতরার মতো লেগে থাকা রঙিন লিপিস্টিক থেকে ছিটকে আসা অসহায়ত্ব আমাকে বিমর্ষ করে দিল। আমি নাজ নামের এক মেয়ের ঘরে ঢুকে প্রায় দুঘণ্টা বসে ছিলাম। মেয়েটি অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে যখন প্রায় খিস্তি করার জন্যে রেগে উঠছিল, আমি তার প্রত্যাশিত সম্মানী দিয়ে যখন প্যান্টের চেইন খুললাম, বলল—এত ফুটফুটে ছেলে, তোমার বউ নেই, বান্ধবী নেই; এখানে আসছ ক্যান? আমি ওর কোমল ও করুণ শরীর থেকে টাকা উসুল করে বেরিয়ে এসে বিশাল পদ্মার পাড়ে বসে দেখেছিলাম, নদীর ওপারের দিগন্তরেখা নেমে আসা রাত্রির গহ্বরে বিলীন হয়ে যাচ্ছে; বিশাল নদীটা একা হয়ে যাচ্ছে। নদীর প্রতিটা ঢেউ একা হয়ে যাচ্ছে। ব্রহ্মাণ্ড জুড়ে অবারিত অন্ধকার একা হয়ে যাচ্ছে। হু হু চরের বাতাস একা হয়ে যাচ্ছে। হট্টিটি পাখিদের ডাকগুলো একা হয়ে যাচ্ছে। আমি প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় সঙ্গমের কোনো নারীর মুখ দেখতে পাচ্ছি না, আমার সঞ্চিত স্মৃতিবাক্সটা একা হয়ে গেছে। কেবল আবছা ছাইকালো অন্ধকারে পেণ্ডুলামের মতো দুলছে সেই মিথুন ভাস্কর্য। একা হয়ে যাওয়া স্মৃতি বাক্সটা কাঁধে করে বহুদিন বহুদিন হাঁটতে হাঁটতে আমি একটা নির্জন গ্রামের মধ্যে ঢুকে

যাই। পত্র-পল্লবে ছাওয়া গ্রামের ভেতর দিয়ে বয়ে যাওয়া ছোট্ট ময়ূরাক্ষি নদীর জলে গা ধুতে ভালো লাগত আমার। অকারণ দুলে ওঠা ধানের মাঠের সঙ্গে কথা বলতে ভালো লাগত। একদিন প্রাচীন এক অশ্বত্থতলায় বসে পাখিদের কুড়িয়ে আনা ফলমূলের অবশিষ্টাংশ খাচ্ছিলাম। মাটির পথ রাঙিয়ে এক তরুণী শহরের কলেজের দিকে যাচ্ছিল কাঁখে একবোঝা বই জড়িয়ে ধরে। আমি তার পিছু নিলাম। পিছু পিছু হাঁটতে হাঁটতে আবার একটা বড় শহরে চলে এলাম। এখানে আর হাঁটা নয়। দৌড়ানো। একদিন শহরের জনবহুল পার্কটার মরা-উলুবনে বসে তরুণী আমাকে শেষমেষ বিয়ে করতে চাইল। আর বলল — আরও বেশি... দৌড়াতে হবে।

বিয়ের পরে শত শত বার ঘরে আলো বন্ধ করে দিয়ে মহিমাকে আমি কোলে তুলে নিয়েছি। মহিমাও আমাকে লতায় পাতায় পেঁচিয়ে রাখত। কিন্তু মাঝেই মাঝেই মনে করিয়ে দিত — দৌড়াও; এত বড় শহরে আরামে থাকতে হলে অনেক দৌড়াতে হয়, ইয়ার।

আমি দৌড়াতে থাকি। আর আমার চোখের সামনে দুলে ওঠে আধো-আলো-অন্ধকার ঘর। আমি আমার বাবা-মায়ের পাশে শুয়েছিলাম। কখন যেন ঘুম ভেঙে গিয়েছিল — অন্ধকারের মায়ার ভেতরে দুটো আদিম ভাস্কর্য নেচে বেড়াচ্ছে...

আয়নাল হকের সাথে

ঐশ্বরিয়া রাই, কারিনা কাপুর বা সানি লিয়নকে কমোডে বসে হাগতে দেখলে বা ওদের মলদ্বার দিয়ে ফরাৎ ফরাৎ করে বেরিয়ে আসা সূর্যমুখীর হলুদের মতো গু দেখলে বা কোষ্ঠকাঠিন্য থাকার ফলে ঐ সূর্যমুখী হলুদের সাথে কয়েকবিন্দু রক্ত লেগে থাকা দেখলে কিংবা কমোডে বসে ওদের ছ্যার ছ্যার করে মোতার শব্দ শুনে কান ঝালাপালা হয়ে যাওয়ার পরেও টিভির পর্দায় ঐশ্বরিয়া রাই, কারিনা কাপুর বা সানি লিয়নের গতর সর্বস্ব নাচানাচি দেখেও যে কারো পুরুষাঙ্গের স্যালুট দিয়ে ওঠা সম্ভব? — এমন প্রশ্নবান পরিতোষ আমার দিকে ছুঁড়ে দিলে আমার প্রথমেই মনে পড়ে যায় — মোহিনী মোহন স্ট্রিটের ৭২/বি নম্বর ভাড়ার ফ্ল্যাট; — যেখানে রমাকে বিয়ে করে সংসার বিছিয়েছিল পরিতোষ; সেই ফ্ল্যাটের এক নির্জন বৃষ্টির দুপুর আমাকে ঢুকিয়ে দিয়েছিল আলকাতরায় ভরে থাকা প্রাচীন এক ইঁদারার ভেতর। বৃষ্টির দুপুরে নির্জন ফ্ল্যাটে আমি একা। পরিতোষ সকাল সকাল বেরিয়ে গেছে ব্যবসার কাজে। বাপের বাড়িতে রমা। বেশ কিছুদিন হলো। সদ্য বিবাহিত আমি, বউকে ফেলে বন্ধুর সঙ্গে সময়কে পথ ভুলিয়ে দিয়ে আষাঢ়ের অনেক অনেক গল্প শেষ শ্রাবণে করব বলে পরিতোষের ফ্ল্যাটে। পরিতোষ ব্যবসায়, রমা মায়ের বাড়ি, ফ্ল্যাটের কিউবিক নির্জনে একা আমি ডাইনিং টেবিলে রাখা ব্ল্যাক লেবেলের বোতলের দিকে তাকিয়ে আসন্ন রাতে কাজ সেরে বাসায় ফিরলে পরিতোষের সঙ্গের যে প্রকার খোশআমোদে মেতে উঠব তার কিছু খসড়া মাথায় কিলবিলাচ্ছিল। ক্যাটস অ্যান্ড ডগসের এই একলা দিন — পরিতোষের ল্যাপটপে ইন্টারনেট যোগ করে নিয়ে নীল পৃথিবীর মধ্যে ঢুকে পড়ে চুবানি খেয়ে হাঁপাতে হাঁপাতে বেরিয়ে আসি। তারপর ল্যাপটপের ড্রাইভে ড্রাইভে পরিতোষের জমিয়ে রাখা দেশি-বিদেশি নানা সিনেমার সম্ভারে ঢুকে পড়ি। চলচ্চিত্রকার হওয়ার সকল স্বপ্ন ব্যবসার উত্তরোত্তর সাফল্যের ভেতরে চুবানি খেলেও চলচ্চিত্র দেখার ভূত এখনও পরিতোষকে ছেড়ে যায়নি। ক্রফো নামের ফোল্ডারে মাউস টিপে ঢুকতেই আমার চোখের সামনে আর এক নীলের দরজা হা হয়ে

যায়—পরিতোষ আর রমার অজস্র নগ্ন ছবি—চুম্বন, লেহন, সঙ্গমের;—প্রথমে পলক সরিয়ে নিই। কিন্তু আমাকে টানে—গন্ধম। আমি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখি—খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে রমার শরীরের উপত্যকা। দেখে দেখে আমার ভেতরের উদগীরিত লাভায় আমি জ্বলে যেতে থাকি। সদ্য বিয়ে করা আমার স্ত্রী তোতনের মোবাইলে রিং দিয়ে গড়গড় করে সব বলে দিই। তোতন অমাকে ধিক্কার দেয়। বলে—ছিঃ, বন্ধু, বন্ধুর বৌ—কীভাবে দেখছ ওইসব। কিন্তু ততক্ষণে আমার শরীর আমার হাতছাড়া হয়ে গেছে। আমার গরম লাভা ইথারের ভেতর দিয়ে তোতনের কানের ভেতরে গল গল করে গড়িয়ে দিতে থাকি। তোতন আমার বিশ্রি রিপুতাড়নাকে সামাল দিতে না পেরে উপর্যুপরি আমাকে চলভাষে সঙ্গ দেয়। আমি রমার বেডরুমের আলনার পেছন থেকে রমার ব্যবহৃত একটা ব্রা বের করে এনে তার ভেতরে নিজেকে গড়িয়ে দিই। রমা আর পরিতোষের ব্যবহৃত খাটের ওপরে আমি ক্লান্ত-কেলিয়ে পড়ি। ডানাভাঙা পাখির মতো রমার লালটুকটুকে ব্রা পড়ে আছে মোজাইক করা মেঝেতে—পড়ে থাকা ব্রাতে এখন আর রমা কিংবা তোতনের কোনো ছবি নেই। এখন কেবলই একটা কাপড়ের ঠুকরো; আমার স্বেদরক্ত মেখে আহত হয়ে আছে।

সেদিনের পর থেকে যে কয়েকবার রমাকে আমি দেখেছি—তার লাবণ্য, তার মাধুর্য, পাটভাঙা টাঙ্গাইল শাড়ি পরার নিপুণ কৌশল, তার গলায় বিকেল বেলার শান্ত পাহাড়ি নদীর মতো খেলে যাওয়া রবীন্দ্রসংগীত, বাহু-কোমর-পায়ের গোড়ালিতে লেগে থাকা ভরতনাট্যমের ছন্দ আমার কাছে ম্লান হয়ে যায়। আমার কাছে অতি সাধারণ একজন নারী হয়ে ওঠে রমা। অথচ পরিতোষ যখন ওর সঙ্গে প্রেম করত, সোহরাওয়ার্দী উদ্যানের ঘন জঙ্গলের মধ্যে দিন দুপুরে হারিয়ে যেত—আমরা চা গিলতে গিলতে রমাকে নিয়ে নানা রগড় করেছি তখন। সেইসব এখন মেঘলা রাতের মাঝবয়সী পূর্ণিমার মতো ঘোলাটে আমার চোখে। এখন আর বিশেষ করে রমার কোনো আভা আমার সামনে খেলে ওঠে না।

মাত্র চল্লিশ মিনিট ড্রাইভ করে পরিতোষ আমাকে তার বাগানবাড়ির দোতলার ঝুল বারান্দায় এনে ফেললে আমরা আমাদের বিগত যৌনজীবনের নানা স্মৃতি রোমন্থনে ভাসতে থাকি। আট বছর আগের কোনো একদিনে এই বাগানবাড়ির ছাদের ওপরে আতপ্ত জ্যোৎস্নায় কোনো এক নারীর সঙ্গের মিথুন উৎসবের গল্প বলতে থাকে পরিতোষ; আমি অবলীলায় পরিতোষের পাশে রমাকেই দাঁড় করিয়ে

ভাবতে থাকি। রমা না হয়ে অন্য কেউ হওয়াও বেসম্ভব কিছু নয় পরিতোষের জন্যে। যেহেতু আমি পরিতোষের বগলজাত অবস্থায় রমাকেই দেখেছি কেবল — তাই পরিতোষের ল্যাপটপের সেইসব আট বছর আগের রমা আমার সামনে। পরিতোষকে ভিমরি খাইয়ে আমার জিহ্বাচ্যুত হয়ে একটা প্রশ্ন তার কানে হুড়মুড় করে ঢুকে পড়ে — রমাকে ডিভোর্স দিয়ে দিলে শেষ পর্যন্ত। অথচ ওকে বিয়ে করেই তুমি বাড়ি ছাড়লে। সম্পত্তি। পরিবার।

— শেষমেষ ছাড়তেই হলো, জানো তো। হলো না বা আমিই পারলাম না। আসলে অফিসের সহকারী রানিতার সঙ্গে আমাকে বিছানায় দেখে ফেলল রমা। তারপর কিছুতেই আর সহজ হলো না। আমিও রানিতাকে বিয়ে করে ফেললাম।

— তোমার মেয়ে?

— অরুনিতা মায়ের সঙ্গেই আছে। ইস্কাটনের ফ্ল্যাটটা রমাকে লিখে দিয়েছি। মাসে ত্রিশ হাজার। মা মেয়ের জন্যে। ওভার অল আই অ্যাম এ গুড হাসব্যান্ড অ্যান্ড এ গুড ফাদার। অরুনিতার শরীর খারাপ, জ্বর। ফেরার পথে আজ একবার দেখে যেতে হবে। তুমিও চলো।

লিফটের পেটের ভেতর থেকে বেরিয়ে তমার ফ্ল্যাটের সামনে আমরা। পরিতোষের তর্জনীর চাপে কলিংবেল। গোলাপি স্কার্ট আর হলুদ টি-শার্টে চমশা চোখে বিবর্ণ-ফ্যাকাশে রমা — বেশ কয়েক বছর পরে দেখলাম। আমাকে সঙ্গে দেখে তমার বিশেষ কোনো প্রকাশ নেই। স্বাভাবিক, খুবই স্বাভাবিক ও মৃদু বলল — এসো। সোফায় বসলাম। পরিতোষ ঢুকে গেল ভেতরের ঘরে। মুখোমুখি সোফায় রমা। সম্ভবত অরুনিতার ঘরে পরিতোষ; বাবা মেয়ের কথোপকথন ভেসে আসছে। রমার দিকে আমি; কিন্তু দৃষ্টি নিম্নমুখী, টাইলসের দিকে। খুবই সামান্য একটা দুটো কথা।

আমি বাসায় ফিরে ফেসবুক অন করতেই রমার বন্ধুত্বের ডাক এসে ঝুলে আছে, দেখলাম। রমার নানা ছবি নানা পোস্ট ভেসে থাকে ফেসবুকে। স্বয়ংক্রিয় সেই সব আমার চোখের সামনে ভিড় করে। একদিন আমার ইনবক্সে রমার একটি ইউটিউব চ্যানেলের লিংক — সেখানে রমা নানা কাণ্ডকীর্তি করে। কাঁদে, অভিনয় করে, গান গায়, রান্না করে, রূপচর্চা করে, ক্যাটওয়াক করে, গপাগপ খায়, শুয়ে থাকে, বিষণ্ন থাকে, আনন্দে থাকে — শুধু বাথরুমে বসে হাগা-মোতার ছবিটুকু বাদে সবকিছুই। এইসব হিল্লিদিল্লি দেখে আমি নিশ্চিত হয়ে যাই —

রমা মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলেছে। কিন্তু ফেসবুকে রমার প্রোফাইল পিকচার দেখে আমি আশ্চর্য হই—দিনের বেলায় দেখে আসা বিবর্ণ, আভাহীন রমার মিইয়ে যাওয়া মুখটা প্রোফাইল পিকচারের সঙ্গে মেলানোই যাচ্ছে না। অতি অপূর্ব; সাক্ষাৎ টেলিভিশনের কোনো অ্যাংকরের মতো কলকল করে আছে। আমি রমার অ্যালবামে হুমড়ি খাই। ডিভোর্সড রমা, একা রমা, বিষণ্ন রমাকে কোথাও খুঁজে পাই না। অ্যালবামে লাস্যময়ী অজস্র রমা আর ফেসবুকের দেয়ালে রমার সেইসব ঝুলিয়ে রাখা ছবির নিচে অসংখ্য গুণগ্রাহীর প্রশংসা বাণ তীব্র শরের মতো শাবকের কচি মাংসের দিকে। তীব্র পুরুষেরা কেউ কেউ রমার একা থাকার গল্পটা জানে বলেই নানা ফাঁদ পেতে বসার মন্ত্র আওড়ে দিয়েছে মন্তব্যের ঘরে। সেইসব দেখে বড্ড গা ঘিন ঘিন করে আমার। আমি আর বেশিক্ষণ থাকতে পারি না রমার ভার্চুয়াল পৃথিবীতে। নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে হাইরোডের পাশের খাদে পড়ে যাওয়া মোটরগাড়ির মতো বিধ্বস্ত হয়ে পড়ে থাকি।

কিন্তু কতক্ষণ; ফেসবুক খুললেই রমার ইউটিউব চ্যানেলের নানা পোস্ট ভেসে আসে আমার ওয়ালে। রমা আলুর সঙ্গে ময়দা মিশিয়ে লুচি বানানোর রেসিপি দেখাচ্ছে ভিডিওতে, মুগডালে রুইমাছের মাথা, ত্রিশ দিনে কীভাবে পেটের মেদ কমানো যায়—নানা যোগব্যায়াম করে দেখাচ্ছে, গ্রীষ্মের দাবদাহে সূর্যের আক্রমণ থেকে বাঁচার জন্যে মুখে কী ফাউন্ডেশন করতে হবে—মেখে দেখাচ্ছে, ছত্রিশতম জন্মদিনে রমা নিজেকে নিজেই ট্রিট দিচ্ছে কেএফসির নির্জন এক টেবিলে বসে, রাতের নাইটি পরে রমা ইজি চেয়ারে বসে কফি খাচ্ছে আর ওর শুকিয়ে যাওয়া ঠোঁটে গুঁড়ি গুঁড়ি রবীন্দ্রসংগীতের আবহ; রমা একা—একলা রমা ভোর রাত অব্দি ইউটিউব চ্যানেলে বক বক করে যাচ্ছে; আমি দেখি। দেখি একা থাকতে থাকতে রমা নিজেও একটা বিরাট পৃথিবী গড়ে তুলেছে। সেখানে কয়েক হাজার ফলোয়ারস, ভিউয়ারস। প্রশংসা প্রশংসায় ফেসবুকের দেয়াল স্যাঁতসেঁতে হয়ে গেছে।

একদিন এক শ্রাবণের শেষ পূর্ণিমার দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে আমার রাত ভোর হয়ে যাচ্ছিল। বারান্দার ইজি চেয়ারে সময় হারিয়ে ফেলা পেন্ডুলামের মতো দুলছিলাম, দুলছিলাম। তখন মোবাইলের স্ক্রিনে তর্জনী ছুঁয়ে আমি ঢুকে পড়ি ফেসবুকের হলহলে দুনিয়ায়। ঢুকতেই সিডরের জলোচ্ছ্বাসের মতো আমার চোখে হুমড়ি খেয়ে পড়ে রমার একটা পোস্ট; তার নিচে নানা মত কলকলাচ্ছে। রমারও পাল্টা মন্তব্য ঝুলে আছে সেখানে। বিগত জ্যোৎস্নার আভা লেগে থাকা সেই